Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228021147

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228021147

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228021147 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জান্নাতুল ফেরদৌস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 228021147

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

আত্মশুদ্ধি কি? 7

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেন?..8

আল্লাহ তাআলার কাছে কোন অন্তর গ্রহণযোগ্য? 9

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা..11

আত্মশুদ্ধির পথে প্রধান বাধা সমূহ..13

কিভাবে আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব? 16

প্রথম উপায়: মহান ও বিজ্ঞানময় কুরআন পাঠ..17

দ্বিতীয় উপায়: আল্লাহর প্রতি বান্দার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করা..18

তৃতীয় উপায়: আল্লাহর যিকির বা স্মরণ..20

চতুর্থ উপায়: আন্তরিকভাবে তাওবা করা এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ কাছে ইস্তেগফার বা ক্ষমা চাওয়া..22

পঞ্চম উপায়: হিদায়াত এবং অন্তরের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।..24

ষষ্ঠ উপায়:সালাফে সালেহীনের সীরাত বা জীবনী পাঠ করা..26

সপ্তম উপায়: সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্য লাভ করা..30

অষ্টম উপায়: ইখলাস ও নিয়তের পরিশুদ্ধি 34

সাহাবাদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা..37

অন্তরের রোগ ও তার প্রতিকার 38

নিয়মিত আমল – অন্তরের পরিচর্যা 43

নিজেকে প্রতিদিন যাচাই করা বা আত্মসমালোচনা 47

আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও সাহায্য চাওয়া..50

আত্মশুদ্ধি – জীবনের সাফল্য ও শান্তির মূল 54

উপসংহার..56

তথ্যসূত্রঃ..57

ভূমিকা

ইসলামে আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس) একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের আসল সফলতা নির্ভর করে তার অন্তরের পবিত্রতার ওপর। বাহ্যিক কাজ যতই বড় হোক না কেন,যদি অন্তর কলুষিত থাকে তাহলে সেই আমল আল্লাহর কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে আত্মশুদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"الْيَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"

"সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না—সেদিন কেবল সে-ই সফল হবে, যে পরিষ্কার অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে।" [1]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,যে অন্তর পবিত্র, সে-ই আসল সফলতা অর্জন করতে পারে। আত্মশুদ্ধি বা 'তাজকিয়াতুন নাফস' এটি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ প্রশস্ত করে।

আত্মশুদ্ধি মানে শুধু পাপ থেকে দূরে থাকা না—আত্মশুদ্ধি হলো এমন এক অবস্থান, যেখানে অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় ঝুঁকে পড়ে,চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়,আর চরিত্র হয়ে ওঠে তাঁর পছন্দের মতো।এই শুদ্ধতা পেতে দরকার—তাওবা করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা,তাঁর জন্য অন্তরে ভয় রাখা, বেশি করে তাঁকে স্মরণ করা এবং নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

"قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا"

"সে-ই সফল হয়েছে, যে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে একে কলুষিত করেছে।" [2]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল ভিত্তি তার আত্মা বা নফসের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি নিজের মন ও অন্তরকে গুনাহ, অহংকার, হিংসা আর খারাপ প্রবৃত্তি থেকে শুদ্ধ করে, তাকেই আল্লাহ সফল বলেছেন। আর যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে গাফিলতি, কুপ্রবৃত্তি ও পাপের দিকে ছেড়ে দেয়, সে-ই ধ্বংসের পথে চলে যায়।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,এখানে বোঝানো হয়েছে, মানুষের ভেতরটা যদি ভালো না হয়, তার বাহ্যিক কোনো আমলই তাকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করবে না। তাই অন্তর পরিশুদ্ধ করাই একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিরক, রিয়া, হিংসা, অহংকারের মতো রোগ থেকে হৃদয়কে মুক্ত করে আল্লাহর প্রেম, তাকওয়া, ধৈর্য, ইখলাসের মতো গুণে ভরিয়ে দিতে পারলেই একজন মানুষ প্রকৃত সফল হতে পারে।

একজন মুসলিমের জীবনে আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল নয়, বরং অন্তরের পরিবর্তন, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা এবং ঈমানের শক্তি বৃদ্ধির একটি মাধ্যম।এর মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনই আসল সফলতা, যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির পথ দেখায়।

আত্মশুদ্ধি কি?

শাব্দিক অর্থে, আরবি শব্দ "تَزْكِيَة" (তাযকিয়া) ক্রিয়ামূলক শব্দ, যার অর্থ "পরিশুদ্ধ করা" বা "পবিত্র করা"।

দর্শন ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাযকিয়া মানে হচ্ছে বৈষয়িক চাহিদা ও কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে, অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা। এটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষ তার অন্তরকে অশ্লীলতা, নিন্দনীয় আচরণ, এবং কদর্য বিষয় থেকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়।

আল্লাহ তায়ালার স্মরণ আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

স্বীয় আত্মাকে সবধরনের পাপ ও অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে মুক্ত রাখাই তাযকিয়াহ এর উদ্দেশ্য।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেন?

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিজের নফস বা আত্মাকে শুদ্ধ করা।

কারণ,এই আত্মাই মানুষকে ভালো কিংবা মন্দ কাজের দিকে ঠেলে দেয়।যদি এই আত্মা নিয়ন্ত্রণে না থাকে,তাহলে মানুষ ইমান আনার পরও ভুল পথে চলে যেতে পারে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির ওপর।

কুরআনে আল্লাহ বলেন–
“তিনি তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।” [3]

এখানে ‘পরিশুদ্ধি’ শিক্ষা দেয়ার কাজকে কিতাব ও হিকমতের আগে বলা হয়েছে। কারণ, যদি মন-মানসিকতা, চরিত্র ও আত্মা শুদ্ধ না হয়, তাহলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে মানুষটা বিপদগামী হয়ে যেতে পারে।

একজন মানুষ দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে, কিন্তু যদি সে হিংসুক হয়, মানুষের ক্ষতি করে, অহংকারে ভোগে—তবে তার নামাজ হয়তো বাহ্যিকভাবে ঠিক, কিন্তু তার আত্মা এখনো অশুদ্ধ। ঠিক এ কারণেই ইসলাম আত্মশুদ্ধিকে এত গুরুত্ব দিয়েছে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন,
"আত্মাকে শুদ্ধ করা ফরযে আইন—যেমন নামাজ ফরয, ঠিক তেমনি আত্মশুদ্ধিও ফরয। কারণ, পাপ মুক্ত না হলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ অসম্ভব।"

আত্মশুদ্ধি ছাড়া ইবাদতের স্বাদ আসে না। মন একাগ্র হয় না, কান্না আসে না, দোয়া কবুল হয় না। অথচ পরিশুদ্ধ অন্তরই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়।

সুতরাং আত্মশুদ্ধি কোনো বিকল্প বিষয় নয়, বরং এটা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। এটি ছাড়া ইমান পূর্ণতা পায় না, আমল স্থায়ী হয় না, এবং আল্লাহর নৈকট্যও অর্জিত হয় না।

আল্লাহ তাআলার কাছে কোন অন্তর গ্রহণযোগ্য?

আমরা সবাই আল্লাহর কাছে কবুল হতে চাই। চাই, তিনি যেন আমাদের নামাজ কবুল করেন, দো'আ কবুল করেন, আর কিয়ামতের দিনে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে দিন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—আল্লাহ কার দো'আ কবুল করেন? কার নামাজ গ্রহণ করেন? কোন অন্তর তাঁর দরবারে পছন্দনীয়?

এখন, আমরা সবাই জানি আমাদের বাহ্যিক কাজ, যেমন নামাজ, রোজা, হজ, এবং অন্যান্য ইবাদত সবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এগুলোর সাফল্য আসবে কেবল তখনই, যখন আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ থাকবে। অন্তরের শুদ্ধতা ছাড়া, আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদতই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা এমন একটি পরিশুদ্ধ অন্তর চান, যা পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রতি প্রেম, ভয়, এবং ভালোবাসায় পূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
"আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা দেহের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে তাকান।" [4]

এই হাদীসটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষ আমাদের বাহ্যিক দিক দেখে বিচার করে, কিন্তু আল্লাহ আমাদের হৃদয় দেখেন। আমাদের অন্তরে কী আছে—ভালোবাসা, লোভ, ঈমান, সন্দেহ, অহংকার সবই তাঁর অজানা নয়। তাই সেই অন্তরই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, যেখানে তার জন্য আছে একনিষ্ঠতা, বিনয়, তাওহীদ, তাওবা আর ভালোবাসা।

একজন মানুষ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও, যদি তার অন্তরে বিনয় না থাকে, ইখলাস না থাকে, তাহলে সেই নামাজ হয়তো কেবল এক দুনিয়াবি দায়িত্ব পালন ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু কেউ যদি একান্তভাবে আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে বলে "হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, আমাকে ক্ষমা করো" তবে সেই অন্তর আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে।

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য অন্তর হতে হলে, আমাদের প্রথম কাজ হলো অন্তরকে গুনাহের বোঝা থেকে হালকা করা।

অহংকার, হিংসা, রিয়া, গিবত,কু-চিন্তা এই সব কিছু আমাদের অন্তরকে কলুষিত করে ফেলে। যদি আমরা এগুলোর সাথে আপস করি, তাহলে আমাদের অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। আর এই অন্ধ অন্তর দিয়ে আল্লাহকে চিনতে পারা যায় না।

একজন মুমিন তার অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর যিকির করে, চোখের পানি ফেলে, কুরআনের আয়াত পড়ে কেঁদে ওঠে। এই কাঁদা, এই যিকির,এই কুরআনের শব্দ সব মিলে তার অন্তর হয় এক সুন্দর বাগান,যেখানে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি পড়ে।

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনেও আমরা এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই। তিনি নিজেই ছিলেন সবচেয়ে পবিত্র অন্তরের অধিকারী। তিনি সবসময় দোয়া করতেন–
“হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির রাখো।” [5]

একজন নবী, যার অন্তর আল্লাহর আলোয় ভরে গেছে, তিনিও তাঁর অন্তরের পরিশুদ্ধতার জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদতেন!

তাহলে আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে থাকি?

আমাদের উচিত, আমাদের অন্তরকে প্রতিদিন পরীক্ষা করা। আমি আজ কারো সম্পর্কে হিংসা করেছি কি? কারো অনিষ্ট চেয়েছি কি? কারো ভালো দেখে মন খারাপ হয়েছে কি? আমি কি আমার কাজগুলো একান্তই আল্লাহর জন্য করছি? আমি কি আসলে আল্লাহকে ভয় করি, নাকি শুধু লোক দেখাতে কিছু করি? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি মন থেকে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমার অন্তরের কোথাও জং ধরে গেছে।

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য অন্তর গড়তে হলে, আমাদের প্রতিদিন তাওবা করতে হবে, কুরআন পড়তে হবে বুঝে, আল্লাহর যিকির করতে হবে ভালোবেসে, দূরদ পড়তে হবে,কাঁদতে হবে একাকী রাতে, দোয়া করতে হবে অশ্রুসিক্ত চোখে।

আমাদের অন্তর যেন হয়ে ওঠে নরম আল্লাহর ভালোবাসায় গলে যাওয়া এক হৃদয়। কারণ, সেই অন্তরই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা

আত্মশুদ্ধি মানে হচ্ছে আত্মাকে গোনাহ থেকে মুক্ত করা, নিজের খারাপ অভ্যাস, অহংকার, হিংসা,গিবত, রিয়া এসব থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে আল্লাহর দিকে ফেরানো।

আর এই আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় ও বাস্তব উদাহরণ হলেন আমাদের প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি গুনাহ থেকে নিরাপদ ছিলেন, আল্লাহর প্রিয় ছিলেন, যাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল আল্লাহর জন্য। তবুও তিনি দিনরাত আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন, বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, নিজের অন্তরকে সবসময় পরিশুদ্ধ রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আত্মশুদ্ধির যাত্রা শুরু হয় নবী হওয়ার আগেই।তিনি খুব কম কথা বলতেন, মিথ্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন, অন্যায় দেখলে তার মন কাঁদত। একসময় তিনি একাকী হেরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে বসে থাকতেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন হতেন। দুনিয়ার অন্যায়, জুলুম, মিথ্যাচার সব তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। এই ভাবনাগুলোই ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

নবুওয়ত পাওয়ার পর আত্মশুদ্ধির বিষয়টি তাঁর জীবনে আরও প্রকাশ পায়। কষ্ট, দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সবকিছু তিনি সহ্য করেছেন, তবুও কারো বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি। যখন তায়েফের লোকেরা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করল, তখনও তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি ওদের হেদায়েত দাও, ওরা জানে না।” এটি এক সাধারণ মানুষের কথা নয় এটি একজন পরিশুদ্ধ অন্তরের মানুষের কথা, যে আল্লাহর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, মাফ করে দিতে পারে।

রাসূল (সাঃ) জীবনের প্রতিটি ধাপে মানুষের হৃদয় গঠনের চেষ্টা করেছেন। তিনি কেবল বাইরের আচরণে পরিবর্তন আনেননি, বরং মানুষকে অন্তর থেকে বদলে দিয়েছেন। সাহাবীদের এমন এক অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, যেখানে তারা দিনরাত আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় কাঁদতেন।

তিনি নিজেও প্রতিদিন ৭০ বার, কেউ কেউ বলেন ১০০ বারের বেশি ইসতেগফার করতেন। অথচ তিনি তো ছিলেন নির্দোষ! তবুও বলতেন, “আমি কি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারি না?”এ এক গভীর আত্মশুদ্ধির কথা, যেখানে ইবাদত হয় কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে নম্রতা ছিল আত্মার সৌন্দর্য। তিনি কখনো কারো মুখের ওপর কঠোর কথা বলতেন না। কেউ যদি ভুল করত, তিনি খুব মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিতেন। কেউ তাঁকে গালিগালাজ করলেও তিনি জবাবে দোআ করতেন। তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আত্মশুদ্ধি মানে শুধু নামাজ-রোজা নয়, বরং মানুষের সঙ্গে আচরণেও নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখা।

তিনি এতটা বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁর ঘরে মাসের পর মাস আগুন জ্বলত না।খেজুর আর পানি দিয়েই জীবন কাটত। কিন্তু কোনো দিন অভিযোগ করতেন না, বরং আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি মানুষকে কুরআন শিখাতেন, আল্লাহর যিকির শিখাতেন, গুনাহ থেকে দূরে থাকতে বলতেন। আর বলতেন, “সাবধান! দুনিয়া ধোঁকা, অন্তরকে নষ্ট করে দেয়।” তিনি চাইতেন, তাঁর উম্মতরা যেন পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হয়।

আজ যদি আমরা সত্যিকারের আত্মশুদ্ধি চাই, তাহলে রাসূল (সাঃ) এর জীবনকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাঁর মতো নম্রতা, তাঁর মতো ক্ষমাশীলতা, তাঁর মতো ভালোবাসা এসব আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে। তিনি ছিলেন আত্মশুদ্ধির জীবন্ত পথপ্রদর্শক।যিনি আমাদের দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন মানুষ আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন থেকে জীবন কাটাতে পারে।

যে অন্তর আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে চায়, পরিশুদ্ধ হতে চায়, সেই অন্তরের সামনে রাসূল (সাঃ) এর জীবন এক আলোকবর্তিকা।এই পথের আলো অন্তরকে করে নরম, পাপ থেকে ফিরিয়ে দেয়, আর হৃদয়কে ভরে দেয় প্রশান্তিতে।

আত্মশুদ্ধির পথে প্রধান বাধা সমূহ

আত্মশুদ্ধি মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সহায়তা করে এবং তাকে আত্মিক শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবন দেয়।তবে আত্মশুদ্ধির পথে কিছু বাধা আমাদের সামনে আসে, যা আমাদের পরিশুদ্ধি লাভে বাধাগ্রস্ত করে।এ বাধাগুলির কারণে আমাদের অন্তর অশুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আমরা আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে চলে যাই। তবে এগুলোর সাথে যুদ্ধ করে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হয়।

আত্মশুদ্ধির পথে প্রধান বাধা সমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. নিজের নফস বা প্রবৃত্তির প্রলোভন

আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমাদের নিজেদের নফস বা প্রবৃত্তি। প্রতিটি মানুষের ভিতরে একটি অশুদ্ধ প্রবৃত্তি থাকে যা তাকে খারাপ কাজের দিকে ঠেলে দেয়। এ নফস আমাদের ভালো কাজ করার ইচ্ছাকে দমন করে এবং অন্যথায় ক্ষতিকর চিন্তা বা কাজের দিকে মনোযোগ দেয়।নফসের প্রলোভন এমন এক শক্তি যা আমাদের অন্তরকে অশুদ্ধ করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন–
"যে তার নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে সফল হবে"। [6]

নফসের প্রলোভন এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাদের আত্মশুদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

২.দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা

দ্বিতীয় বড় বাধা হলো দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা। আজকাল মানুষ দুনিয়াবি সুখ-সুবিধার জন্য এতটাই পাগল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর স্মরণ ও পরকালীন জীবনের দিকে তার মনোযোগ থাকে না।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন–
"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের জীবনের উপর প্রাধান্য দিও না"। [7]

দুনিয়ার আকর্ষণ একসময় আমাদের মনকে এতটা আবদ্ধ করে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলি। আত্মশুদ্ধির পথে চলতে হলে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা কমিয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.গুনাহ বা পাপ কাজের প্রতি আকর্ষণ

যখন আমরা পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ি, তখন আমাদের অন্তর কালো হয়ে যায় এবং আল্লাহর নিকট আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।পাপের কারণে আমাদের অন্তরে এক ধরনের কঠোরতা সৃষ্টি হয়, যা আমাদের আত্মশুদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"যখন বান্দা পাপ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।" [8]
তাই গুনাহ বা পাপ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে আমাদের অন্তর শুদ্ধ থাকতে পারে এবং আমরা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারি।

৪.অলসতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব

আত্মশুদ্ধির পথে চলতে গেলে আমাদের পরিশ্রম ও সততা প্রয়োজন। তবে অনেক সময় মানুষ অলস হয়ে পড়ে এবং আত্মশুদ্ধির পথে চলতে শুরুর পরও থেমে যায়। এর কারণ হলো নিজেদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন–
"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরিশ্রম করে, তার জন্য সকল পথ সহজ হয়ে যায়"। [9]

৫.জ্ঞান ও শিক্ষা কম থাকা

আত্মশুদ্ধির পথে অন্যতম বাধা হলো অজ্ঞতা বা দ্বীন সম্পর্কে কম জানা।আমরা যদি ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করি, তবে আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধি কঠিন হয়ে পড়ে।ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–
“জ্ঞানীরা অজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ।” [10]

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে তোলে।

৬.রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত

অনেক সময় মানুষ ইবাদত ও ভালো কাজ করে শুধু মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য এটাকে বলা হয় রিয়া বা লোক দেখানো। এটি আত্মশুদ্ধির এক মারাত্মক অন্তরায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরক।”
সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী?”
তিনি বললেন, “রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা)।” [11]

রিয়ার কারণে আমলের আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

৭.অহংকার ও আত্মপ্রশংসা

আত্মশুদ্ধির পথে অহংকার সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু। যে ব্যক্তি নিজেকে সবার চেয়ে উত্তম মনে করে, তার হৃদয়ে বিনয় আসে না। অথচ বিনয়ই আত্মশুদ্ধির মূল ভিত্তি।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
“আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না”। [12]

নিজের ভুল ও দুর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে মাথা নত করাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির প্রকৃত পথ।

৮.খারাপ সঙ্গের প্রভাব

খারাপ সঙ্গের প্রভাবও আত্মশুদ্ধির পথে একটি বড় বাধা। মানুষ সমাজে বাস করে এবং তার জীবনযাত্রা অন্যদের প্রভাবিত হয়। যদি আমাদের সঙ্গী খারাপ হয়, তাহলে আমরা তার প্রভাব থেকে বাঁচতে পারি না এবং আত্মশুদ্ধির পথে চলতে ব্যর্থ হতে পারি। ইসলামে ভালো সঙ্গী নির্বাচন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"তোমরা এমন সঙ্গী নির্বাচন করো, যে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে"। [13]

তাই, খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা এবং ভালো সঙ্গী নির্বাচন করা আমাদের আত্মশুদ্ধির পথে সহায়ক হবে।

কিভাবে আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব?

দেহের অসুস্থতা যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা হয়, তেমনি আত্মার অসুস্থতা ও কলুষিত অবস্থাও পরিশুদ্ধ করতে হয়। অন্তর যদি পরিশুদ্ধ থাকে, তবে বাহ্যিক কর্মকাণ্ডও কল্যাণকর এবং পবিত্র হয়।আর যদি অন্তর কলুষিত হয়, তবে তার প্রভাব ব্যক্তির কাজকর্ম এবং আচরণেও পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"মানবদেহে একটি অঙ্গ রয়েছে, যদি সেটি ভালো থাকে,তবে সারা দেহ ভালো থাকে;আর যদি সেটি খারাপ হয়ে যায়,তবে সারা দেহ খারাপ হয়ে যায়।সেটা হচ্ছে কলব (হৃদয়)।"[14]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি আমাদের বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) নিজে দোয়া করতেন,
"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিশুদ্ধ অন্তর কামনা করছি।"
তিনি আরও বলতেন, "হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দিন।" [15]

আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, এটি একটি জীবনযাত্রার অংশ,যা আমাদের সব কিছুতে প্রতিফলিত হয়।একে অতিক্রম করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের কিছু পদ্ধতি দেখিয়েছেন, যা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং জীবনকে আরও উন্নত ও সুন্দর করতে সহায়ক।

প্রথম উপায়: মহান ও বিজ্ঞানময় কুরআন পাঠ

আত্মশুদ্ধির প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো কুরআন পাঠ। কুরআন শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া এক নিয়ামত। কুরআন পাঠ করলে একদিকে যেমন আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, তেমনি জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

কুরআনের একেকটি আয়াত আমাদের অন্তরে আলোর মতো প্রবাহিত হয়, আমাদের মনের সকল ধোঁয়াশা দূর করে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

কুরআন পাঠের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করি, তেমনি অন্যদিকে আমাদের অন্তরে এক শান্তি এবং প্রশান্তি আসে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন–
"তারা যারা আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর শান্তি পায়, নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়।" [16]

এই আয়াতটি আমাদের শেখায় যে কুরআন আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি দেয় না, বরং এটি আমাদের মনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে।

কুরআন শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস নয়, এটি একটি বিজ্ঞানময় গ্রন্থও। কুরআনের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষাগুলি আমাদের আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

তবে, কুরআন পড়া কেবল মুখস্থ বা শ্রবণ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এর পাঠ, তাৎপর্য বোঝা এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করা আত্মশুদ্ধির একটি প্রধান মাধ্যম। কুরআন যেভাবে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে, তেমনি এটি আমাদের জীবনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয় উপায়: আল্লাহর প্রতি বান্দার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করা

আত্মশুদ্ধির পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মাধ্যম হলো আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করা। একজন মুমিনের হৃদয়ে যখন আল্লাহর জন্য ভালোবাসা জাগ্রত হয়, তখন সে সব পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়,তখন সে আর গুনাহে স্বস্তি পায় না, পায় না শান্তি। তার অন্তর কেবল আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়, তাঁরই আদেশ পালনে আনন্দ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
"তবে যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।" [17]

এই আয়াত আমাদের শেখায়, মুমিনদের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় স্থানটি হওয়া উচিত আল্লাহর জন্য। কেননা, তিনি আমাদের রব, দয়াময় ও পরম করুণাময়। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিচ্ছেন, বিপদে সাহায্য করেন, গুনাহ করলে বারবার ক্ষমা করেন। এমন রবকে ভালো না বেসে থাকা কি একজন মুমিনের পক্ষে সম্ভব?

রাসূল (সাঃ) বলেন–
"তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে–
(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সে সর্বাধিক ভালোবাসবে
(২) কাউকে ভালোবাসবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
(৩) কুফরে ফিরে যাওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ভয়ংকর মনে হবে।" [18]

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কেবল মুখের কথা নয়, এটা অন্তরের গভীর অনুভব,এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমলে।

আর আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হয় তাঁকে জানা। তিনি কীভাবে আমাদের প্রতি দয়া করছেন, কীভাবে তিনি আমাদের জীবন পরিচালনা করছেন এসব বিষয়ে চিন্তা করলেই অন্তরে তাঁর মহত্ব উপলব্ধি হয়। তাই কুরআন তিলাওয়াত, রাসূলের (সাঃ) জীবনী পাঠ, আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবা এসবই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে।

এই ভালোবাসাই আত্মশুদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। যার হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, তার আত্মা অন্ধকারে ডুবে থাকে। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা জেগে ওঠে, সে আলোর

পথে হাঁটতে শুরু করে। তার হৃদয় গুনাহ থেকে ঘৃণা করে, আর খাঁটি আমলের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হলে সবার আগে আল্লাহকে ভালোবাসতে শেখা দরকার। যখন কারো অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়, তখন তার অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে। সে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে চায়, নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, আর জান্নাতের পথে চলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় উপায়: আল্লাহর যিকির বা স্মরণ

আত্মশুদ্ধির পথে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আল্লাহর যিকির। কারণ, যিকির অন্তরের খাদ্য। যে অন্তর আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, সে অন্তরই বেশি পরিশুদ্ধ থাকে। আর যে অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল, সেই অন্তর ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়, গুনাহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

জীবনে অনেক সময় এমন হয়, আমাদের অন্তর ভারী লাগে, ইবাদতে মন বসে না, চোখে পানি আসে না, গুনাহ করে ফেলি বারবার। তখন আমাদের দরকার হয় এমন কিছু, যা ভিতর থেকে আমাদের শক্তি দেয়, আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়। সেই কাজটাই করে যিকির। কারণ, যিকির মানুষের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।" [19]

আমরা সবাই শান্তি চাই। কেউ খোঁজে সম্পদে, কেউ খ্যাতিতে, কেউ মানুষের ভালোবাসায়। কিন্তু সত্যিকার প্রশান্তি কেবল আল্লাহর যিকিরেই মেলে এটাই কুরআনের কথা।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন:
"তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে ভেজা থাকে।" [20]

রান্না করার সময়, হাঁটার সময়, কাজের ফাঁকে প্রতিটি মুহূর্তেই যদি কেউ আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে তার জীবনটাই হয়ে ওঠে একটানা ইবাদতের ধারা।

যারা বেশি যিকির করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"যে ব্যক্তি দিনে অনেকবার আল্লাহর যিকির করে,আল্লাহ তার জন্য অনেক রাস্তা খুলে দেন, যা দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য সহজ হয়।" [21]

যিকিরের উপকারিতা:

•অন্তর নরম হয়

•গুনাহ কমে যায়

•আল্লাহর ভয় জাগে

•একাকিত্ব দূর হয়

•হৃদয় প্রশান্ত থাকে

যিকির মানুষকে সবসময় আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত রাখে। তখন একা থাকলেও সে একা থাকে না। বিপদে পড়লেও সে ভেঙে পড়ে না। কারণ তার ভরসা আল্লাহ। আর এই আল্লাহভিত্তিক মনোভাবই আত্মশুদ্ধির বড় উপহার।

চতুর্থ উপায়: আন্তরিকভাবে তাওবা করা এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ কাছে ইস্তেগফার বা ক্ষমা চাওয়া

তাওবা এবং ইস্তেগফার হল এমন দুটি বিশেষ উপায়, যা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

মানুষ মাত্রই ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক।কখনো আমরা না চাইলেও ভুল করে ফেলি, আবার অনেক সময় ইচ্ছা করেই কিছু ভুল করি। কিন্তু তাতে দুঃখিত হওয়ার এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটা পথ রয়েছে, যা আমাদের জীবনের শান্তি এনে দেয়। সেই পথটি হল তাওবা এবং ইস্তেগফার।

তাওবা শুধু পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার বিষয় নয়, এটি একটি প্রতিজ্ঞা যে আমরা আবার সেই ভুলটি করবো না। যখন আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাই এবং ক্ষমা চাই, তখন আল্লাহ আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, এবং আমাদের অন্তর শান্তি পায়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইস্তেগফারের বিষয়ে বলেছেন–
“যে ব্যক্তি তাওবা করে,আল্লাহ তার পাপ মাফ করেন।” [22]

তাওবা করার আগে, আমাদের আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করতে হবে। একে শুধু কেবল মুখে উচ্চারণ করা নয়, বরং হৃদয়ে গভীর অনুশোচনা থাকতে হবে। আমাদের অন্তর হতে কোনো ধরনের অহংকার, গর্ব বা শত্রুতা দূর করতে হবে, এবং তাওবা করার সময় আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। শুধু মুখে তাওবা করা নয়, বরং বাস্তবে নিজেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা, আবার সেই একই ভুলের দিকে ফিরে না যাওয়া, এটা হলো প্রকৃত তাওবা।

তাওবা করার সময় আমাদের আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন, তা সত্যিই অপরিসীম। কারণ, আল্লাহই আমাদের সমস্ত কিছু দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের প্রতি অনেক দয়ালু। আমাদের ভুলের পরও যদি আমরা তাওবা করি, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করেন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো,তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন।" [23]

এর মানে যখন আমরা একান্তভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আল্লাহ আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন, আমাদের হৃদয়কে শান্তি প্রদান করেন এবং আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন।

ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) হল প্রতিদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

রাসূল (সাঃ) ছিলেন সবচেয়ে পবিত্র।কিন্তু তিনি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার ইস্তেগফার করতেন। এই ইস্তেগফারের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রমাণ করতেন। এটি আমাদের শেখায় যে, প্রতিদিন কিছু সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে পরিশুদ্ধ রাখতে পারি।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"যে ব্যক্তি প্রতিদিন ‘অস্তাগফিরুল্লাহাল আজীম’ (আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলে, আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ করে দেন, যদিও সে পাপগুলো সমুদ্রের মত অনেক বেশি হয়।" [24]

রাসূল (সাঃ) ছিলেন সকল পাপ থেকে মুক্ত, তবুও তিনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এটি আমাদের শেখায় যে, ইস্তেগফার এবং তাওবাহ আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস হওয়া উচিত।আমাদের উচিত প্রতিদিন আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা এবং তাঁর পথে চলতে থাকার চেষ্টা করা। এটি আমাদের পাপ মাফ করার পাশাপাশি অন্তরে শান্তি ও পরিশুদ্ধি এনে দেয়।

পঞ্চম উপায়: হিদায়াত এবং অন্তরের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

আত্মশুদ্ধির পথে হাঁটতে গেলে একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় ভরসা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও হিদায়াত। কারণ, অন্তর পরিশুদ্ধ করা মানুষের নিজের হাতে পুরোপুরি সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ তাআলা নিজে সেই অন্তরকে হিদায়াত দেন, তাকে পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করেন।

আর কেউ যদি সত্যিকার অর্থে নিজের অন্তরকে পবিত্র করতে চায়, নিজেকে খাঁটি একজন মু'মিন বানাতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সাহায্য চাইতেই হবে। আর সে সাহায্য চাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো দোয়া।

'হিদায়াত' শব্দের অর্থ—সঠিক পথ দেখানো। ইসলামের পরিভাষায় হিদায়াত মানে, এমন পথযাত্রা যা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

আমরা প্রতিদিন নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআনের প্রথম সূরায় বলি—
"ইহদিনাস্-সিরাত্বাল মুস্তাকিম"
হে আল্লাহ! আমাদের সরল পথে চালাও। [25]

হিদায়াতের জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও দোয়া করতেন:
"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।" [26]

এ দোয়া যেন আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে যায়। কারণ,আমরা জানি না, কখন আমাদের অন্তর বিপথে চলে যাবে, কখন ভুলকে সঠিক মনে হতে শুরু করবে। তাই আল্লাহর কাছে অন্তরের সংশোধন চাওয়া।এটা কেবল মুখের কথা নয়, বরং আত্মশুদ্ধির গভীর প্রার্থনা।

দোয়া একটি আশ্চর্য শক্তি। এটা একান্তভাবে বান্দার আল্লাহর কাছে নিজেদের অসহায়তা প্রকাশ করার ভাষা। হজরত মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন:
"হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।"
এই দোয়া আমাদের শেখায় অন্তরের সংকোচ, চিন্তা, অস্থিরতা দূর করতে আল্লাহর কাছে চাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" [27]

তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজের অন্তরের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করা—

•হে আল্লাহ!আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

•হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ দেখাও।

•হে আল্লাহ! তুমি আমার কলবকে ভালোবাসার, খুশুর, তাকওয়ার আলোয় পরিপূর্ণ করে দাও।

•হে আল্লাহ! আমাকে তোমার প্রিয় বান্দা বানিয়ে নাও।

•হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দিন, যে আপনাকে ভালোবাসে, আপনার ভয় করে এবং আপনার কাছে ফিরে আসে।

•হে আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে রিয়া, অহংকার, হিংসা, গিবত, হসদ এসব দূর করে দিন।

এই দোয়া গুলো মুখে বলার পাশাপাশি মন থেকে চাইতে হবে। আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে, নরম অন্তরে ফিরে আসতে হবে।

নবী-রাসূলদের দোয়া থেকে শিক্ষা

নবী ইউনুস (আঃ) যখন মাছের পেটে বন্দি ছিলেন, তখন কী বলেছিলেন?

"লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ-জালিমীন।"

অর্থ: "আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, আমি ছিলাম যালিমদের একজন।" [28]

এই দোয়া আমাদের শেখায়, বিপদের সময়ও অন্তরের শুদ্ধি আর আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার দোয়া।

দোয়া করলে কী লাভ হয়?

•আল্লাহর কাছে অন্তর নরম হয়।

•গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি পাওয়া যায়।

•আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

•গুনাহ মাফ হয়

•ঈমান দৃঢ় হয়।

তাই অন্তর সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে বারবার ফিরে যাওয়া, কাঁদা, দো'আ করা। যে যত বেশি দোয়া করে,সে তত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

ষষ্ঠ উপায়:সালাফে সালেহীনের সীরাত বা জীবনী পাঠ করা

আত্মশুদ্ধির পথে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণার উৎস হলো সালাফে সালেহীনের সীরাত বা জীবনী।

“সালাফে সালেহীন” বলতে বোঝানো হয় সেই সব পূর্বসূরি মহান মানুষদের, যাঁরা আল্লাহর রাস্তা অনুসরণ করেছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁদের মধ্যে আছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, এবং পরে যুগে যুগে যেসব আলেম, ইমাম, আউলিয়া এবং দুনিয়ার মোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে আখিরাতের দিকে যাত্রা করেছেন। তাঁরা ছিলেন এমন এক জামাত, যারা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব উদাহরণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করে সুন্দরভাবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।" [29]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, যে সকল মানুষ সাহাবা ও সালাফদের অনুসরণ করবে, তাদের ওপর তাঁর সন্তুষ্টি বর্ষিত হবে। আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভই তো আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত সাফল্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–
সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর তাদের পরবর্তী, এরপর তাদের পরবর্তী।" [30]

এ হাদীসে তিনি সালাফে সালেহীনদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদর্শত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠতম যুগের মানুষদের জীবনযাপন আমাদের জন্য এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

সালাফে সালেহীনের সীরাত পাঠ করার মাধ্যমে একজন মুমিন নিজের গন্তব্যকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারে। যখন সে পড়ে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন, তখন সে বুঝতে পারে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কাকে বলে। যখন সে জানে, হযরত উমর (রাঃ) রাতে মানুষের খোঁজ নিতে পথে বেরিয়ে যেতেন, তখন তার হৃদয় সেবার স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) যখন বলেন, “আমি এমন জাতির সাথে বসবাস করেছি, যাঁরা তোমাদের মতো নয়। যখন তারা রাতের অন্ধকারে নামাজে দাঁড়াতো, তখন চোখ থেকে অশ্রু

গড়িয়ে পড়তো, আর সকালে তাদের চেহারা হতো বিমর্ষ” তখন আমাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে।

এই সমস্ত সীরাত আমাদের দেখায়, কীভাবে একজন মানুষ নিজের অন্তরকে আল্লাহর জন্য সাজাতে পারে। তাঁরা কিভাবে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, কীভাবে লোভ-হিংসা-মাল-সম্পদের মোহ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছেন, এবং কীভাবে দুনিয়ার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছেন এসবই আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির এক জীবন্ত পাঠ।

মানুষ সাধারণত তত্ত্বে যতটা প্রভাবিত হয়, বাস্তব জীবনের গল্পে তার চেয়ে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়। যখন কেউ পড়ে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাতের বেলা অজু ছাড়াই ঘুমাতেন না, আর এক রাতেই শেষ করে ফেলতেন গোটা কুরআন—তখন মনের গভীরে এক আত্ম-উপলব্ধি জন্ম নেয়। আমি কী করছি? আমার রাতগুলো কেমন কাটে?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন–
“নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।” [31]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই সর্বোত্তম, কিন্তু সেই আদর্শকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করে যাঁরা দেখিয়েছেন, তাঁদের জীবনীও আমাদের জন্য শিক্ষার ভাণ্ডার। তাঁরা ছিলেন সেই নক্ষত্র, যারা রাসূলের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেছেন।

সীরাত পাঠের মাধ্যমে অন্তরের পরিবর্তন আসে।সালাফে সালেহীনদের জীবনী কেবল কিছু ঘটনা নয়, বরং তা এক একেকটি আত্মশুদ্ধির পথনির্দেশনা।তাঁদের জীবনী আমাদের শিখিয়ে দেয়—
•কিভাবে অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হয়
•কিভাবে চোখের পানি দিয়ে গুনাহ মুছে ফেলা যায়
•কিভাবে নফসের খারাপ চাহিদাকে দমন করে আত্মাকে আল্লাহর পথে চালিত করা যায়

যেমন: ইমাম গাযযালী (রহ.) তিনি দুনিয়ার উচ্চ মর্যাদা ত্যাগ করে ইখলাস ও আত্মশুদ্ধির খোঁজে যাত্রা শুরু করেন।
ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহ.) ডাকাতি থেকে তাওবার পথে এসে যুগের আউলিয়া হয়ে যান।
এমন অসংখ্য উদাহরণ সালাফের জীবনভর ছড়িয়ে আছে—যা আমাদের নিজেকে পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা দেয়।

তাঁদের সীরাত কেন আমাদের পড়া জরুরি?

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য: তাঁদের জীবন কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে গঠিত। তাঁদের অনুসরণ করলে আমরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব।

২. নফস ও গুনাহর বিরুদ্ধে জিহাদ শেখার জন্য: তাঁরা কিভাবে নিজের নফসের সাথে লড়েছেন, গুনাহ ছেড়েছেন, সেটাই আত্মশুদ্ধির মূল শিক্ষা।

৩. তাওবার পথ শিখার জন্য: গোনাহগার থেকে কিভাবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায়, তা সালাফদের জীবনেই পাওয়া যায়।

৪. দু'আ, কান্না ও ইবাদতের অনুপ্রেরণা পেতে: তাঁরা কিভাবে রাত জেগে আল্লাহর সামনে কাঁদতেন, কীভাবে দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতেন—এসব আমাদের অন্তরকে আন্দোলিত করে।

সীরাত পাঠের উপকারিতাঃ

•অন্তর নরম হয়
•অহংকার ভেঙে যায়
•গুনাহ থেকে বিরত থাকার শক্তি আসে
•আমল ও ইবাদতে মনের আগ্রহ বাড়ে
•আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জন্মায়
•আল্লাহর ওয়ালীদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়

কীভাবে পড়ব সালাফদের সীরাত

•প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু সময় নির্ধারণ করা
•কুরআনের আয়াত ও হাদীসসহ সীরাত পড়ার চেষ্টা করা
•শেখা অনুযায়ী জীবন সংশোধনের নিয়ত করা
•নোট করা

উপযুক্ত কিছু বই ও গ্রন্থ

•হায়াতে সাহাবা – সাহাবীদের জীবনী
লেখক:মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)

•সিফাতুস সফওয়া – তাবেয়ীন ও বুযুর্গদের জীবন
লেখক:ইবনে জাওযী (রহ.)

•তাজকিরাতুল আউলিয়া – আউলিয়াগণের আত্মশুদ্ধির গল্প
লেখক:ফারীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)

•আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ইতিহাসভিত্তিক একটি বড় গ্রন্থ
লেখক: ইবনে কাসীর (রহ.)

সালাফদের জীবন আমাদের জন্য এক বাস্তব আদর্শ। তাদের জীবন ছিল যেমন সুন্দর, তেমনই গভীরভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কপূর্ণ। তাঁরা ছিলেন নিভৃত সাধক, যারা বাহ্যিক নয়, অন্তর শুদ্ধির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন।তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টাই আত্মশুদ্ধির আসল শিক্ষা।

সপ্তম উপায়: সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্য লাভ করা

আত্মশুদ্ধির পথে চলতে চাইলে শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না, বরং এমন পরিবেশ এবং সঙ্গী প্রয়োজন যারা আমাদের ইমানকে দৃঢ় করবে, গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং আল্লাহর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ভালো মানুষদের সাহচর্য গ্রহণ করতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
"তুমি নিজের অন্তরকে এমন লোকদের সঙ্গে সংযুক্ত রাখো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আর দুনিয়ার শোভা কামনায় তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিও না।" [32]

এই আয়াত আমাদের শেখায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা হল সেইসব মানুষ যারা তাঁর যিকিরে, নামাজে, কুরআন পাঠে মগ্ন থাকে।এদের সঙ্গে থাকার মধ্যেই রয়েছে নাজাত ও আত্মিক পরিশুদ্ধি।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।" [33]

এখানেও লক্ষ্য করা যায়,আল্লাহ কেবল তাকওয়া অবলম্বনের কথা বলেননি, বরং সেইসাথে সৎ ও সত্যবাদী লোকদের সঙ্গে থাকার নির্দেশও দিয়েছেন। কারণ, সৎ মানুষদের সাহচর্য না পেলে সেই তাকওয়াও টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলছেন–
"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।" [34]

আরেকটি হাদীসে এসেছে—
"সৎ ও অসৎ সাথীর দৃষ্টান্ত হলো আতর বিক্রেতা ও লোহার কামার। আতর বিক্রেতা হয়তো তোমাকে কিছু আতর উপহার দেবে,অথবা তুমি তার থেকে কিনবে,অথবা তার কাছ থেকে ভালো ঘ্রাণ পাবে।আর কামারের কাছে গেলে হয়ত তোমার কাপড়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগবে,অথবা তার গন্ধে তুমি কষ্ট পাবে।" [35]

এই হাদীস আমাদের চোখ খুলে দেয়,সহচর্য কেবল সামাজিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি আমাদের দ্বীন, আখলাক এবং চিরস্থায়ী পরিণতির উপর প্রভাব ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে একজন আরেকজনের ঈমানের খেয়াল রাখতেন। তাঁরা একে অপরকে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে শেখাতেন, ভুল করলে নরমভাবে মনে করিয়ে দিতেন, এবং সর্বদা একে অপরকে নেক আমলের দিকে উৎসাহিত করতেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:
"যে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তার সাহচর্য গ্রহণ করো। আর যে দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলে, তার থেকে দূরে থাকো।"

হযরত উওয়াইস আল-কারনী (রহ.) ছিলেন এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্য পাননি, কিন্তু তাঁর প্রতি এতটাই ভালোবাসা ছিল যে, রাসূল (সাঃ) সাহাবিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে পেলে যেন তাঁর কাছে দু'আ করিয়ে নেয়া হয়। এমন মানুষদের সাহচর্য আত্মাকে আলোকিত করে, জীবনকে বদলে দেয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এমন অনেক সময় সৎ লোকদের খোঁজ করতেন শুধু কিছু সময় কাটাতে, যেন হৃদয় কোমল হয়। তিনি বলতেন, "সৎ মানুষের মুখ দেখাও ইবাদত।"

ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন–"সৎ মানুষের সান্নিধ্য এমন এক বাগান, যেখানে অন্তর ফুল ফোটে আর আমল গন্ধ ছড়ায়।"

ইমাম আহমদ (রহ.) বলতেন, "যদি আল্লাহ কোনো বান্দার ভালো চান, তিনি তাকে নেককার লোকদের সাহচর্যে রাখেন।"

সৎ সহচর্যের উপকারিতা

১.আন্তরিকভাবে আল্লাহমুখী হওয়া সহজ হয়

ধার্মিক মানুষের সঙ্গ আমাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলে। তাদের মুখে আল্লাহর নাম, চোখে নম্রতা, চলনে সালেহীনদের গাম্ভীর্য থাকে। তাদের মাঝে থাকলে ঈমানী অনুভূতি জেগে ওঠে।

২. ভুল ও গুনাহ চিনতে পারি

নেক লোকেরা আমাদের গুনাহকে হালকা করে নেয় না। বরং সুন্দরভাবে আমাদের সাবধান করে দেয়। যেমন: "বন্ধু, এটা না করলেই ভালো হয়" বা "ভাই, নামাযটা আজ মিস করে ফেললেন কেন?" এই ছোট ছোট কথাই অনেক সময় অন্তরে বড় প্রভাব ফেলে।

৩.আখিরাতের চিন্তা জাগে

তাদের কথাবার্তায় জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা, মৃত্যুর স্মরণ, হাশরের প্রস্তুতির কথা শোনা যায়। এতে করে দুনিয়ার মোহ কেটে যায়, অন্তর জাগ্রত হয়।

৪.সুন্দর চরিত্র গঠনের সুযোগ

সৎ মানুষের সঙ্গ কেবল আমল নয়, আখলাকও গঠনে সাহায্য করে। ধৈর্য, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, দানশীলতা এসব গুণ তাদের জীবনে দেখা যায়। ধীরে ধীরে তা আমাদের মধ্যেও গড়ে ওঠে।

৫.গুনাহ থেকে দূরে রাখে

যে সঙ্গীরা নিজেরাও গুনাহ থেকে বাঁচে, তারা আমাদেরও গুনাহ থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। তারা চোখ-কান-হৃদয়কে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

৬.জান্নাতের পথ সহজ হয়

এমন সঙ্গীরা শুধু দুনিয়ার বন্ধু নয়, আখিরাতেও বন্ধু হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ বলেন–

"বন্ধুবান্ধবরা সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে,তবে মুত্তাকিরা (আল্লাহভীরু লোকেরা) ব্যতীত।" [36]

আধুনিক জীবনে উত্তম সাহচর্যের প্রয়োজন আরও বেশি।এই যামানায় ফিতনার পরিমাণ এত বেশি,মানুষ এতটাই ব্যস্ত আর গাফেল যে একাকী চলতে গেলে ঈমান বাঁচানো খুবই কঠিন। সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি, অশ্লীলতা, দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই এখনকার দিনে উত্তম সঙ্গীর প্রয়োজন আরও বেশি।

এমন কিছু মানুষের সহচর্য দরকার–

•দ্বীন নিয়ে কথা বলে,
•নামাজের কথা মনে করায়,

•যারা কুরআন তেলাওয়াত করে,
•আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয় হিকমতের সঙ্গে,
•আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় জাগিয়ে তোলে।

যাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা জরুরি:
যেমন ভালো মানুষের সঙ্গ আত্মাকে উন্নত করে, তেমনি গোনাহগার ও অসৎ মানুষের সঙ্গ অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—
“তুমি অবাধ্যদের অনুসরণ করো না, যারা সীমালঙ্ঘন করে।” [37]

এমন মানুষদের থেকে দূরে থাকা জরুরি–
•যারা গীবত ও বাজে কথা বলে
•দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে
•যারা গুনাহকে গোনাহ মনে করে না
•যারা আমাদেরকে গুনাহে প্রলুব্ধ করে
•যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে দ্বীনকে ত্যাগ করে
•দুনিয়া ও হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝে না

ভালো সহচর্য যেভাবে গড়ে তোলা যায়–
•মসজিদে নিয়মিত গেলে।
•ভালো দ্বীনদার বন্ধু বানালে।
•ইসলামি মাহফিল ও হালকায় অংশ নিলে।
•ঘরে ও অনলাইনে নেক আমলীদের সাথে যুক্ত থাকলে।
•নিজের চরিত্র এমন করে গড়ে তোলা যেন অন্যরাও আপনার সঙ্গ চায়।

সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্যে থাকার একটি বড় সুবিধা হলো, তা আমাদের আমল ঠিক রাখতে সাহায্য করে। যখন চারপাশে অনেকে ভালো কাজ করছে, তখন নিজেও গাফেল থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। আর তারা ভুল করলে আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আবার পথ দেখায়। তাই আত্মশুদ্ধির পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

অষ্টম উপায়: ইখলাস ও নিয়তের পরিশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির পথে চলার জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দরকার, তা হলো ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়ত। আমাদের আমল, ইবাদত, দান, সদকা, দ্বীনী কাজ সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। আর এই নিয়ত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহলে সেই কাজের মুল্য আছে। কিন্তু যদি তা হয় মানুষকে দেখানোর জন্য, লোকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য, তাহলে সে কাজ আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।

ইখলাস' শব্দের অর্থ পরিশুদ্ধ করা, একনিষ্ঠ হওয়া, কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করে ফেলা। ইসলামী পরিভাষায় ইখলাস মানে সব কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা, মানুষের প্রশংসা, দুনিয়ার কোনো স্বার্থ বা ব্যক্তিগত গৌরবের জন্য নয়।

নিয়ত এমন এক জিনিস, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আমলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়। একজন মানুষ হয়ত সারারাত ইবাদত করল, কিন্তু তার ইখলাস না থাকলে আল্লাহর কাছে সেই ইবাদতের কোনো দাম নেই। অপরদিকে, কেউ যদি খুব সামান্য ভালো কাজও একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে, তবে সেটি আল্লাহর কাছে অনেক মহৎ হয়ে ওঠে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
“তাদেরকে তো কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যেন তারা একনিষ্ঠভাবে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই দ্বীন পালন করে, তাঁরই ইবাদত করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। এটাই সঠিক ধর্ম।” [38]

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবাদতের মুল উদ্দেশ্যই হলো একনিষ্ঠভাবে, খাঁটি নিয়তে, শুধু আল্লাহর জন্য তা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে তার নিয়তের প্রতিফল।" [39]

এই হাদীসটি ইসলামি শিক্ষার মূল স্তম্ভগুলোর একটি। এতে বোঝা যায়, কোনো কাজ বাহ্যিকভাবে কতো বড় বা চমৎকার তা মুখ্য নয়, বরং সে কাজের ভেতরের নিয়তটাই আসল।

ইখলাস না থাকলে একজন মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে নামাজ পড়ে,রোযা রাখে,দান করে কিন্তু এগুলোর উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে দেখানো, প্রশংসা পাওয়া বা অন্য কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ তাহলে সেই কাজ আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।

হাদীসে এসেছে–
“যে তিন ধরনের মানুষ প্রথম জাহান্নামে যাবে, তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিখেছিল ও পড়েছিল শুধু মানুষের প্রশংসার জন্য।” [40]

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন:
"যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে, সে শিরক করেছে। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে, সে শিরক করেছে।" [41]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়,লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করলে তা শিরকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রিয়া বা লোক দেখানো এমন একটি গোপন রোগ, যা আমলের ভিতর থেকে তার বরকত ও সওয়াব কেড়ে নেয়।

ইখলাস অর্জনের উপায়

১. নিজের অন্তরের দিকে নিয়মিত নজর রাখা:
ইখলাস অর্জনের প্রথম ধাপই হলো নিজের অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করা। প্রত্যেকটি কাজের আগে ও পরে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে,
“আমি এই কাজটা কার জন্য করছি?”
“আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নাকি মানুষের প্রশংসার আশায়?”
এই আত্মসমালোচনার অভ্যাস থাকলে শয়তান ও নফসের ধোঁকায় পড়ে রিয়া (লোক দেখানো) কাজ করার সম্ভাবনা কমে যায়।

২. আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা (তাকওয়া অর্জন):
আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের খবর জানেন। তাঁর সামনে কোনো কিছুই গোপন নয়। এই বিশ্বাস যত গভীর হবে, ইখলাস তত সহজ হবে।

কুরআনে এসেছে–
নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে,গোপন করো বা প্রকাশ করো।”[42]

যে ব্যক্তি জানে, "আমার অন্তরের খবরও আল্লাহ জানেন" সে লোক দেখানোর চিন্তা সহজে করতে পারে না।

৩. গোপনে ইবাদত করা:

রাসূল (সাঃ) বলেন,আল্লাহর প্রিয় বান্দা হল সেই ব্যক্তি,যে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত জানে না বাম হাত কী করছে।

গোপনে ইবাদত করলে মানুষের প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেমন:

•গোপনে দান করা

•একা একা কুরআন পড়া

•রাতের বেলা কারও অজান্তে তাহাজ্জুদ পড়া

এই কাজগুলোতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। ফলে নিয়ত খাঁটি থাকে।

৪. রিয়ার ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা:

লোক দেখানো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তা শাস্তির কারণ হয়। তাই সবসময় মনে রাখতে হবে,

যদি কোনো কাজ শুধু লোক দেখানোর জন্য করি, তবে তা হবে 'ছোট শিরক'।

হাদীসে এসেছে:

"আমি রিয়ার (লোক দেখানোর) ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।" [43]

এই ভয় অন্তরে থাকলে ইখলাস রক্ষা সহজ হয়।

৫.সৎ ও ইখলাসপূর্ণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা:

যারা নিজেরা ইখলাস নিয়ে জীবন কাটান তাদের সহচর্যে থাকলে আমরাও ইখলাস শিখতে পারি।

তাদের কথা, কাজ, উপদেশ ও আচরণ আমাদের প্রভাবিত করে। যেমন সাহাবীদের মধ্যে ইখলাস ছিল অসাধারণ। তাই তাদের জীবনী পড়া ও অনুসরণ করাও ইখলাস অর্জনের এক উপায়।

সাহাবাদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা

সাহাবাদের মধ্যে ইখলাস ছিল অনন্য।তাঁদের প্রতিটি কাজেই ছিল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য। প্রশংসা,খ্যাতি বা দুনিয়ার কোনো লোভ তাঁদের নাড়াতে পারত না। তাঁরা আমল করতেন গোপনে, দান করতেন চুপিচুপি, ইবাদত করতেন নির্জনে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) নিঃস্ব হয়ে দান করেছেন।তাবুক অভিযানের সময় রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের মাঝে দান করার জন্য আহ্বান জানালে হযরত উমর (রাঃ) নিজ মনে ভাবলেন, "আজ আমি আবু বকরকে ছাড়িয়ে যাব।"
তিনি তাঁর সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এলেন।
রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিবারের জন্য কী রেখে এলে?"
তিনি বললেন, "অর্ধেক।"
এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) এলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে।
রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিবারের জন্য কী রেখে এলে?"
তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে।"

এমন নিখাদ ইখলাস কেবল তাঁর হৃদয়ে ছিল। কোনো প্রকার অহংকার বা নিজের কীর্তির গর্বও তিনি প্রকাশ করেননি।

হযরত উমর (রাঃ) একদিন নিজেই বলেন:
"আমার যদি জান্নাতের নিশ্চিত খবরও দেওয়া হয়, তবুও আমি ইখলাস ছাড়া কোনো আমলের ভরসা করি না।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। কিন্তু বহুদিন তিনি তা গোপন রেখেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন এই আমল যেন শুধু আল্লাহর জন্য হয়, মানুষের প্রশংসার জন্য নয়।

তাঁর ইখলাসের কারণে আল্লাহ তাঁকে স্মরণশক্তি ও হাদীস শিক্ষার বিশাল তাওফিক দান করেন।

ইখলাস এমন এক গুণ যেটা না থাকলে আমল অর্থহীন হয়ে যায়। আবার, শুধু ইখলাস থাকলেই ছোট কাজও আল্লাহর কাছে বড় হতে পারে। তাই নিয়ত ও অন্তরের পরিশুদ্ধি প্রতিনিয়ত সাধনার বিষয়।

অন্তরের রোগ ও তার প্রতিকার

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের অন্তরের রহস্য জানেন। তিনি পবিত্র অন্তরই গ্রহণ করেন, যা খাঁটি বিশ্বাস, সৎ নিয়ত ও নিষ্কলঙ্ক ঈমানের পূর্ণতা নিয়ে ভরা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তর পরীক্ষা করেন এবং পবিত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যে অন্তর পবিত্র, তার মন শান্ত হয়। কিন্তু যে অন্তর অশুদ্ধ বা রোগাক্রান্ত, সে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যায়, গুনাহের বৃত্তে আটকে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—
"বিপরীত লোকেরা হলো তারা যারা তাদের অন্তর পচে গেছে, আল্লাহ তা আর পবিত্র করেন না কারো অন্তর, তবে যাকে তিনি চান এবং যার কাছে তিনি তার স্মরণ পাঠান।" [44]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
"নিশ্চয়ই অন্তর পবিত্র করলে সমস্ত দেহও পবিত্র হয়।" [45]

তাই আত্মার রোগ চিহ্নিত করা এবং তাকে সুস্থ করা অত্যন্ত জরুরি।

আত্মার রোগ কীভাবে হয়?

আত্মা সহজাতভাবে পবিত্র। কিন্তু বারবার গুনাহ করতে করতে সে কালিমা পড়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলেন–
"যখন বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ করতে থাকে, তখন পুরো অন্তর ঢেকে যায় কালোতে।" [46]

এই অন্তরের কালো দাগ আসলে আত্মার অসুখ। এই অসুখ কখনো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর প্রভাব পুরো জীবনে ছড়িয়ে পড়ে।

নিচে আত্মার কিছু গুরুতর রোগের কথা তুলে ধরা হলো:

১.রিয়া (লোক দেখানো)

রিয়া হলো এমন কাজ করা, যাতে মানুষ দেখে বাহবা দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি মুখ্য থাকে না। অথচ ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

“অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে,সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।” [47]

২. অহংকার

অহংকার এমন এক রোগ, যা ইবলিসকে ধ্বংস করেছে। অহংকার অন্তরকে কঠিন করে দেয়, মানুষকে বিনয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

“যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [48]

৩. হিংসা

হিংসা মানুষের অন্তরকে পোড়ায়, শান্তি কেড়ে নেয়। হিংসা এমন একটি আগুন, যা নিজের সওয়াবকেও জ্বালিয়ে ফেলে।

রাসূল (সাঃ) বলেন–

“তোমরা হিংসা করা থেকে বেঁচে থাকো।কেননা হিংসা নেক আমলগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে,যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে।” [49]

৪.গাফেল অন্তর

যে অন্তর আল্লাহর স্মরণে থাকে না, তা গাফেল। এই অন্তর ধীরে ধীরে পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন সংকুচিত হয়ে যাবে।" [50]

অন্তরের রোগের প্রতিকার

১. আন্তরিক তাওবা ও ইস্তিগফার

যে অন্তর রিয়া,অহংকার বা হিংসায় আক্রান্ত, তার জন্য প্রথম চিকিৎসা হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা করা। রিয়ার মত গোপন শিরক ও অহংকারের মত বড় গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য নিয়মিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
“আর আমি তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করি, যারা অজ্ঞতাবশত গোনাহ করে, তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাওবা করে।” [51]

২. কুরআন তিলাওয়াত ও গভীর অনুধাবন

কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্য নয়,এটা হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য নাজিল হয়েছে। এটি আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করে, হেদায়াতের আলো জ্বালায় এবং গোপন ব্যাধিগুলোর প্রতিকার করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
“এটা একটি কিতাব,যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে জ্ঞানীরা শিক্ষা গ্রহণ করে।” [52]

তাই প্রতিদিন অন্তত কয়েকটি আয়াত হলেও চিন্তা করে পাঠ করা উচিত। কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। কেউ যখন হৃদয় দিয়ে কুরআন পড়ে, তখন সেই হৃদয় ধীরে ধীরে রিয়া, হিংসা, অহংকারের মতো ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়।

৩. নিয়মিত যিকির করা

যিকির হলো সেই আত্মিক ওষুধ, যা অন্তরের শক্তি ও প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে।যিকির অন্তরকে সতেজ করে, পাপ থেকে দূরে রাখে এবং হৃদয়কে আল্লাহর ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করো।” [53]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

"তোমরা কি জানো,তোমাদের আমলনামায় সবচেয়ে উত্তম,সবচেয়ে পবিত্র,তোমাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ করবে,এবং যা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম?"
সাহাবারা বললেন,হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।
তিনি বললেন, 'আল্লাহর যিকির।" [54]

অন্তর শুদ্ধির জন্য কিছু শক্তিশালী যিকির

১. সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ কতই না পবিত্র!)
এই যিকির হৃদয় থেকে অহংকার দূর করে, অন্তরে আল্লাহর মহত্ব গেঁথে দেয়।

২. আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)
এই যিকির হিংসা ও হাহাকার দূর করে, কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয় ভরিয়ে তোলে।

৩. আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই)
প্রতিদিন এ যিকির অন্তরকে গুনাহের বোঝা থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর দয়ার ছায়ায় নিয়ে আসে।

৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)
এটি অন্তরের শিরক, রিয়া ও দুনিয়ার আসক্তি দূর করে একনিষ্ঠতার আলো জাগায়।

৫. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ
এই যিকির একজন মুমিনকে আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে শেখায় এবং মানসিক শান্তি দেয়।

এগুলো প্রতিদিন সকালে, রাতে ও চলার পথে পড়তে পড়তে অভ্যাসে পরিণত করা উচিত।

রাসূল (সাঃ) বলছেন–
"তোমার জবান সবসময় আল্লাহর যিকিরে ভেজা রাখো।" [55]

৪. সদকা ও নেক কাজ
একজন মুমিন যখন নিজের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তখন তার অন্তর ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হয়। দানের মাধ্যমে কৃপণতা দূর হয়, এবং অন্তরে বিনয় ও দয়া গড়ে ওঠে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন–
“সদকা গুনাহ মুছে দেয়,যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।” [56]

৫. সৎ মানুষের সঙ্গ ও ভালো পরিবেশ

একজন মানুষ যেমন পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হয়, তেমনি তার অন্তরও ভালো বা মন্দ সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভালো মানুষদের সঙ্গ অন্তরকে প্রশান্তি দেয়, নেক আমলের জন্য উৎসাহ যোগায় এবং নফসের মন্দ প্রবৃত্তি কমায়।

কুরআনে এসেছে–
“আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা সঙ্গী হবে তাদের, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন – নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। আর তাদের সঙ্গই তো উত্তম সঙ্গ।” [57]

৬.নফসকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা

আত্মশুদ্ধির জন্য নফসের বিরুদ্ধে লড়াই অপরিহার্য। নিজের চাওয়া-পাওয়া, গর্ব বা লোভকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত মুজাহাদা।

একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক, সে যেন নিজের অন্তরকে নিয়মিত পর্যালোচনা করে এবং এই রোগগুলো থেকে মুক্তির জন্য কুরআন-হাদীসের আলোকে নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে। কারণ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কেবল সেই অন্তরই গ্রহণযোগ্য হবে, যা শিরক, রিয়া, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

নিয়মিত আমল – অন্তরের পরিচর্যা

আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয়কে সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে, যেন তা তাঁর স্মরণে শান্তি পায়।এই অন্তর যদি নিয়মিত পরিচর্যা না পায়, তাহলে তা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়, গাফেল হয়ে পড়ে। আর সেই গাফেল হৃদয়কে শয়তান সহজেই বন্দি করে ফেলে।

তাই অন্তরের পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন কিছু নিত্যদিনের আমল যেগুলো ছোট হলেও অন্তরকে জীবিত রাখে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে।

নিয়মিত আমল:

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়

নামাজ কেবল শরীরের নয়, বরং অন্তরেরও প্রশান্তি আনে।

আল্লাহ বলেন–
“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [58]

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অন্তরের গাফেলতা দূর করে, অন্তরে আল্লাহর ভয় ও প্রেম সৃষ্টি করে। যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে, তাদের অন্তর অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে থাকে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
“তোমাদের কেউ যদি প্রতিদিন পাঁচবার একটি নদীতে গা ধোয়, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে?” সাহাবারা বললেন, “না।” তিনি বললেন, “এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত; এতে আল্লাহ বান্দার গুনাহগুলো মুছে দেন।” [59]

২. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত

আল্লাহর কালাম অন্তরকে নরম করে। যারা নিয়মিত কুরআন পড়ে, তাদের অন্তরে নূর থাকে।

কুরআন নিজেই বলে–
“হে মানুষ, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং অন্তরের রোগের আরোগ্য।” [60]

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবিদের জীবনে কুরআন তিলাওয়াত ছিল দৈনন্দিন অভ্যাস। তাঁরা শুধু তিলাওয়াতই করতেন না, বরং প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। অন্তরের পরিচর্যার জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় কুরআন পাঠ, অনুবাদ ও তাফসীর পড়া আমাদের অভ্যাসে পরিণত করা দরকার।

৩. যিকির ও ইস্তিগফার করা

আল্লাহর স্মরণে অন্তর জীবিত হয়।

হাদীসে এসেছে–

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহও তাকে ভুলে যান।" [61]

সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও হালকা করে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার অভ্যাস হৃদয়কে আল্লাহমুখী রাখে।

৪. সকালে-সন্ধ্যায় দোয়া ও যিকির

প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যা এই দুই সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময়গুলোতে কিছু নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকির পড়তেন, যা অন্তরকে শান্ত করে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করে।

যেসব দোয়া ও যিকির পড়া উচিত:

•আয়াতুল কুরসি (সূরা বাকারা: ২৫৫)

এটা এমন একটি আয়াত, যা পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

•তিন কুল – সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস

সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়লে আল্লাহ আমাদের অনেক অদৃশ্য ক্ষতি থেকে হেফাজত করেন।

•আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আ-ফিয়াহ...

এই দোয়াটি নবীজি নিয়মিত পড়তেন। এতে আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাই।

•ছোট ছোট যিকির করা

যেমন:

√সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী

√লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু

এই আমলগুলো আমাদের রক্ষা করে শয়তান, গুনাহ ও অস্থিরতা থেকে।

৫. রাতে তাহাজ্জুদ পড়া

তাহাজ্জুদ সালাত হলো এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা রাতে মানুষ ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদত করে। এই সালাত অন্তরকে নরম করে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়।

কুরআনে বলা হয়েছে–

“আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত হিসেবে। সম্ভবত তোমার রব তোমাকে একটি প্রশংসনীয় স্থানে তুলে নেবেন।” [62]

তাহাজ্জুদ অন্তরের গোপন কথাগুলো আল্লাহর সামনে প্রকাশের সুযোগ। এই সময়ে দোয়া বেশি কবুল হয়, অন্তরও পরিশুদ্ধ হয়।

৬. আল্লাহর জন্য সময় নির্ধারণ করা

প্রতিদিন ব্যস্ত জীবনের মাঝেও আল্লাহর জন্য আলাদা একটু সময় নির্ধারণ করা দরকার।যেখানে থাকবে কেবল আল্লাহর কথা, আল্লাহর জন্য চোখের অশ্রু, চিন্তা ও নিরবতা।

হাদীসে এসেছে–

“যে আল্লাহকে একাকী অবস্থায় স্মরণ করে এবং চোখে অশ্রু আসে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় রাখবেন।”[63]

এই নির্ধারিত সময় অন্তরের জন্য হয় বিশেষ এক প্রশান্তির সময়।

৭. নিজের গুনাহ নিয়ে ভাবা

নিজের ভুল, গুনাহ, গাফেলতা নিয়ে নিয়মিত চিন্তা করা।এটি অন্তরকে নরম করে, অহংকার দূর করে, আল্লাহর দিকে ফেরায়। সাহাবীরা যেমন প্রতিটি গুনাহকে পাহাড়সম মনে করতেন, তেমনভাবেই আমাদের ভাবা উচিত।

৮. ভালো কাজের চেষ্টা করা

প্রতিদিন অন্তত একটি ভালো কাজ করার নিয়ত করা। যেমন: কাউকে সাহায্য, গোপনে দান, কারো কষ্ট লাঘব করো এমন কাজ অন্তরকে নরম রাখে।

৯. দোয়া

দোয়া হলো মুমিনের প্রাণ। এটি এমন এক আমল, যা না শুধু মুখে উচ্চারিত হয়, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে। যখন মানুষ কাঁদে, যখন কারো কাছে বলার মতো কিছু থাকে না, তখন সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে এটাই দোয়া। এটি অন্তরের কান্না, আত্মসমর্পণ আর ভালোবাসার প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা নিজেই আমাদের দোয়ার জন্য ডাক দিয়েছেন–
"তোমাদের প্রতিপালক বলেন: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" [64]

প্রতিদিন দোয়া মানে প্রতিদিন একবার নিজের ভাঙা মনটা আল্লাহর হাতে তুলে দেওয়া।তাই প্রতিদিন একটু করে হলেও দোয়া করাটা আমাদের জীবনের অংশ করে নেওয়া দরকার।

অন্তরকে পরিচর্যা করার জন্য বড় কিছু করতে হয় না। ছোট ছোট নিয়মিত আমলই অন্তরের পরিশুদ্ধি আনে। নিয়মিত সালাত, যিকির, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত ও ভালো সঙ্গ অন্তরের আলো বাড়িয়ে দেয়, ঈমানকে জাগ্রত রাখে।

নিজেকে প্রতিদিন যাচাই করা বা আত্মসমালোচনা

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সহজ নয়। কারণ আমরা মানুষ, ভুল করি, ভুলের থেকে ফেরার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে হয়। আর এই প্রচেষ্টার অন্যতম বড় মাধ্যম হলো নিজেকে নিয়মিত যাচাই করা। অর্থাৎ, প্রতিদিন নিজের অন্তর, আমল, কথা-বার্তা, এবং আচরণ পর্যালোচনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও,যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" [66]

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রথমেই নিজের আত্মার দিকে মনোযোগ দিতে। যদি আমি নিজেই জানি না আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তবে আমি কীভাবে সংশোধনের পথ খুঁজব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–
"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি,যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে।"[67]

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব
নিজেকে যাচাই করার অভ্যাস না থাকলে ধীরে ধীরে অন্তরে পাপ জমে যায়, গুনাহ হালকা মনে হতে থাকে, এবং মানুষ নিজের ভুলগুলোকে অস্বীকার করতে শিখে। এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–
"না,তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তরে জং ধরে গেছে।" [67]

এই জং দূর করতে হলে প্রতিদিন অন্তর পরিস্কার করতে হবে, আত্মসমালোচনা করতে হবে। ঠিক যেমন আয়না ধুলো-ময়লা মুক্ত রাখতে হলে নিয়মিত পরিস্কার করতে হয়।

কিভাবে নিজেকে যাচাই করবো?
নিয়মিত আত্মসমালোচনা করার কিছু উপায় নিচে দেয়া হলো:

ক. দিন শেষে কয়েক মিনিট আত্মজিজ্ঞাসা

দিনের শেষে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একান্তে নিজেকে প্রশ্ন করা—

•আমি সালাতে মনোযোগ দিতে পেরেছি কি না?

•আজ আমি আল্লাহর কী কী আদেশ মানার চেষ্টা করেছি?

•আমি কোনো গুনাহ করেছি কি? যদি করে থাকি, তাওবা করেছি তো?

•আজ কারও মনে কষ্ট দিয়েছি কি?

•আমার কাজগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল কি?

এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেই অন্তর জেগে উঠবে।

খ. আমলের তালিকা তৈরি করা

একটি ডায়েরিতে নিজের দিনের কাজ লিখে রাখা যেতে পারে—

•কতবার কুরআন পড়েছি?

•কতবার ইস্তেগফার পড়েছি?

•আজ ১ টাকা সাদাকাহ করেছি?

•কারো হক আদায় করেছি কি না?

•কতবার রাসূলের (সাঃ) ওপর দরুদ পাঠ করেছি?

•আজ কতবার আল্লাহকে একান্তভাবে স্মরণ করেছি?

ধীরে ধীরে এই অভ্যাস একজন মুমিনকে চিন্তাশীল ও আত্মসচেতন বানিয়ে তোলে।

গ. নিয়ত যাচাই

প্রতিটি কাজের পেছনে আমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থাকে। "আমি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলাম, না মানুষের জন্য?"এই প্রশ্নটি নিয়মিত নিজেকে করতে পারলে হৃদয় ধীরে ধীরে রিয়ামুক্ত হয়ে পড়ে।

ঘ. একটি আত্মমূল্যায়ন ডায়েরি রাখা

প্রতিদিন নিজের কাজ, গুনাহ, ভালো অভ্যাস, বদঅভ্যাস, ইবাদত ও গাফলতির সংক্ষিপ্ত লিখিত হিসাব রাখা। এটি সময়ের সাথে আত্মশুদ্ধির এক কার্যকর পথনির্দেশিকা হয়ে উঠবে।

ঙ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেকে পরিমাপ করা

প্রতিদিন একটি আয়াত বা একটি হাদীস পড়ে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যে,আমি এই নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করছি কি না?

সাহাবিদের জীবন থেকে শিক্ষা

সাহাবিদের জীবনে আত্মসমালোচনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।প্রতিদিন তারা নিজেদের অন্তর, কাজ, ইচ্ছা ও নিয়ত নিয়ে চিন্তা করতেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলতেন—
"হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব নাও।"

তাঁরা জানতেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, একেকটি নিঃশ্বাসের হিসাব দিতে হবে।তাই তারা নিজের অন্তরের অবস্থা নিয়মিত যাচাই করতেন।

অন্তরের আত্মসমালোচনায় ঈমানের ঘ্রাণ থাকে

যে অন্তর ভুল করলে কাঁদে, গুনাহ হলে ব্যথা পায়, ইবাদতে ব্যাঘাত হলে ব্যাকুল হয় সেই অন্তরই আল্লাহর কাছে প্রিয়। প্রতিদিনের এই আত্মসমালোচনা অন্তরকে তাজা রাখে, চোখকে অশ্রুসিক্ত করে, জবানকে দোয়ার পথে নিয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–
“মুমিন নিজের গুনাহকে এমন মনে করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর পাহাড়টি তার ওপর ভেঙে পড়বে কিনা সে আশঙ্কায় থাকে।” [68]

নিজেকে প্রতিদিন একটু যাচাই করা, একটু প্রশ্ন করা, একটু চোখে অশ্রু আনা এটাই আমাদের হৃদয়কে জীবিত রাখে, ঈমানকে জাগ্রত রাখে। এটা বাহ্যিক আমলের চেয়ে ভিন্ন,অদৃশ্য তবুও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও সাহায্য চাওয়া

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো ভুল, গুনাহ, অভ্যাস বা দুর্বলতা থাকে, যেগুলো জানি আল্লাহর পছন্দ নয়। কিন্তু এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ না। অনেক সময় চাইলেও পারি না নিজেকে বদলাতে। অন্তর জানে, ঠিক কী করা উচিত, কিন্তু পা যেন ঠিক পথ ধরে না। তখন একজন মুমিন যা করে, তা হলো আল্লাহর কাছে নিজের পরিশুদ্ধতার জন্য সাহায্য চাওয়া।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–
"যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।"[69]

আল্লাহর সাহায্য না থাকলে কেউ সত্যিকারে নিজেকে বদলাতে পারে না। কারণ, অন্তরের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো অন্তর বদলায় না, ঈমান জাগে না, চোখে পানি আসে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মশুদ্ধির দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন মানুষ, যাঁর অন্তর সবচেয়ে বেশি পবিত্র ছিল। তারপরও তিনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন–
“হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ।” [70]

তিনি আরও বলতেন:
“হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তাকওয়া দান করো, এবং তুমি-ই একে পবিত্র করো। তুমিই তার অভিভাবক ও পরিশোধক।” [71]

আমরা যদি সত্যিই আল্লাহর কাছে অন্তর পরিবর্তনের দোয়া করি, তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাদের বদলাবেন। তিনি আমাদের এমন এক অন্তর দেবেন, যা পাপ থেকে ঘৃণা পায়, ভালো কাজকে ভালোবাসে, এবং সব সময় আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে চায়।

আত্মশুদ্ধির প্রকৃত দোয়া

আত্মশুদ্ধির জন্য দোয়া মানে কেবল মুখে কিছু আরবি শব্দ বলা নয়। এটি হৃদয়ের একান্ত এক কান্না, এক গভীর চাওয়া। এমন এক আকুতি, যা মুখে নাও থাকতে পারে, কিন্তু অন্তরে থাকে তীব্রভাবে।

যখন একজন মানুষ গভীর রাতে নিঃশব্দে উঠে, চারপাশে নেমে আসে নিস্তব্ধ অন্ধকার, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে একা আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায়। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে, ভেজা চোখে, হৃদয়ের গহীন থেকে ফিসফিসিয়ে বলে তার মনের সব না বলা কথাগুলো, দুঃখের চাপা কান্না, অপরাধবোধের অনুশোচনা।এই নিঃস্বার্থ আত্মপ্রকাশ, এই অন্তরের কান্নাই আসল আত্মশুদ্ধির দোয়া।

আল্লাহ এমনই দয়ালু। তিনি আমাদের মুখের ভাষা বোঝেন, চোখের ভাষাও বোঝেন। এমনকি বোবা কান্নাকেও শুনে ফেলেন। আল্লাহর কাছে কাঁদা মানেই দোয়া।

নবী-রাসূলগণও আত্মশুদ্ধির জন্য দোয়া করতেন

নবী-রাসূলদের জীবন থেকেই আমরা আত্মশুদ্ধির আসল শিক্ষা পাই। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ, তবুও তাঁরা দিনের পর দিন, রাতের গভীরে, নির্জনে আল্লাহর কাছে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য দোয়া করতেন। তাঁরা জানতেন, অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ প্রিয় হতে পারে না।

হযরত আদম (আঃ) এর দোয়া

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো, দয়া না করো, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়ে যাব।" [72]

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া

"হে আমাদের রব! আমাকে এবং আমার সন্তানদের সালাত কায়েমকারী করো।" [73]

হযরত ইউনুস (আঃ) এর দোয়া

"তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি পবিত্র, আমি অন্যায়কারীদের একজন ছিলাম।" [74]

এসব দোয়া আমাদের শেখায় আত্মশুদ্ধির কামনা শুধু একবারের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের প্রতিদিনের আমল। নবীগণও তাঁদের ঈমান, তাঁদের অন্তর, তাঁদের শেষ পরিণতির জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য চাইতেন।

আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া কেন জরুরি?

একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ হলো নিজের ভেতরের পরিবর্তন আনা।অন্তরের রোগগুলো দূর করে আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া।আত্মশুদ্ধি এক কঠিন সাধনা,যা সফল হয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে।

•কারণ আমরা নিজেরা সত্যিকার শক্তি রাখি না বদলানোর জন্য।

•শয়তান আমাদের সব সময় পথভ্রষ্ট করতে চায়।

•গুনাহ আমাদের অন্তরকে কঠিন করে ফেলে।

•হিদায়াত এবং স্থায়ী আত্মশুদ্ধি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

•অন্তরের রোগ যেমন রিয়া, হিংসা, অহংকার এসব শুধু আল্লাহ-ভীতি আর তাঁর সাহায্যেই দূর হয়।

আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআনের দোয়া

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এমন কিছু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে নিজের আত্মা, অন্তর ও আমলের পরিশুদ্ধি চাইতে পারি। যেমন:

“হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করবেন না, এবং আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে দয়া দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই দানকারী।” [75]

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হিকমত দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের সঙ্গে মিলিয়ে দিন।” [76]

“হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।” [77]

আত্মশুদ্ধির পথ লম্বা, কিন্তু সে পথে আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকলে তা সহজ হয়ে যায়। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো দোয়া। যে যত বেশি নিজের অন্তরের সংশোধনের জন্য

দোয়া করে, সে তত দ্রুত এই পথে অগ্রসর হয়। তাই দোয়াকে নিজের আত্মশুদ্ধির সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী বানানোই একজন মুমিনের মূল কাজ।

আত্মশুদ্ধি – জীবনের সাফল্য ও শান্তির মূল

মানুষের জীবনে প্রকৃত সাফল্য ও স্থায়ী শান্তি তখনই আসে, যখন তার অন্তর আল্লাহর ইবাদত ও ভালোবাসায় ভরে যায়। হৃদয় যখন পাপ, অহংকার, হিংসা, ঈর্ষা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, নিজের আচরণ, চিন্তা ও অনুভূতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিবর্তন আনা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন–
"নিশ্চয়ই, মনুষ্য জাতি এমন এক বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, যে দিন তাদের প্রতি সজাগ করা হবে তারা তাদের কাজের ফল জানতে পারবে।" [78]

এখানে আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন যে, মানুষ তার অন্তরের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে পরকালীন জীবন উপভোগ করবে। তাই অন্তর পরিশুদ্ধ না হলে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অসম্ভব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
"আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা দেহের দিকে নয়, বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে নজর রাখেন।" [79]

অর্থাৎ, মানুষকে পরখ করা হয় তার অন্তরের খুঁত, ঈমানের দীপ্তি এবং তার আমলের সদগুণ দ্বারা। এই জন্য আত্মশুদ্ধি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আত্মশুদ্ধি শুধু পাপ ত্যাগ নয়, এটি অন্তরের এমন এক অবস্থা, যেখানে সৎ নীতি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা, বিনয় এবং দয়ার মতো গুণাবলী বিকশিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

অর্থাৎ, নামাজই অন্তরের রূপকার ও পরিশোধক। ধীরে ধীরে নামাজ, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, তওবা ও নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

রাসূল (সাঃ) এর এক সুন্দর বাণী আছে–

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলো যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়।" [৪0]

এখানেই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ, অন্তরের শৃঙ্খলা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ হলো আত্মশুদ্ধির অপর নাম।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জীবনের সব দিকেই সাফল্য অর্জন করে।দুনিয়াতেও শান্তি, আখিরাতেও সফলতা। কারণ অন্তর যদি পাপ ও মন্দ থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে তা দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

সুতরাং আত্মশুদ্ধি জীবনের একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা আমাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ প্রশস্ত করে। প্রতিদিন অন্তরকে পরিমার্জন করা, ভুল স্বীকার করা, তাওবা করা, এবং আমল ঠিক করা এই চলমান প্রক্রিয়ার অংশ।এ কারণেই আত্মশুদ্ধিকে জীবনের সাফল্য ও শান্তির মূল চাবিকাঠি বলা হয়। কারণ যার অন্তর বিশুদ্ধ, তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমতে পরিপূর্ণ থাকে।

উপসংহার

মানুষের জীবনের আসল সফলতা বাহ্যিক চাকচিক্য, খ্যাতি কিংবা সম্পদে নয় বরং তার অন্তরের পরিশুদ্ধতায়। যখন কোনো হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণ হয়, বিনয় ও তাকওয়ার আলোয় উদ্ভাসিত হয়, তখন সেই অন্তরই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। একটি বিশুদ্ধ অন্তরই পারে মানুষের জীবনকে আলোকিত করতে এবং তাকে আখিরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করতে।

এই থিসিসের প্রতিটি অধ্যায়ে আমি উপলব্ধি করেছি আত্মশুদ্ধি কেবল একটি ইসলামী আদর্শ নয়, বরং একজন মু'মিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও হাদীস আমাদের শিখিয়েছে যে,আল্লাহ তাআলা কেবল বাহ্যিক রূপের দিকে নয়, অন্তরের দিকেই বেশি নজর দেন। আমরা দেখেছি কীভাবে কুরআনের গভীর অনুধাবন, যিকির,দোয়া,তাওবা, আত্মসমালোচনা এবং সৎ সঙ্গ আমাদের অন্তরকে ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ করে।

আত্মশুদ্ধি কোনো একদিনের কাজ নয়।প্রতিদিন নিজের অন্তরে ফিরে তাকানো, নিজের ভুল,ত্রুটি ও গাফিলতির জন্য অনুতপ্ত হওয়া,এবং আল্লাহর দরবারে ফিরে আসার নামই আত্মশুদ্ধি। এই পথ কখনো সহজ নয়, কিন্তু এতে রয়েছে অপার প্রশান্তি এবং অন্তরের পরিতৃপ্তি। এ পথ যত কষ্টকরই হোক না কেন, শেষে আছে সবচেয়ে বড় সফলতা প্রিয় রবের সান্নিধ্য, সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।

আল্লাহর দরবারে আমাদের দুয়া হোক–
"হে আমার রব!আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।আমাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করুন।আমার অন্তরকে পবিত্র করুন,যেন আমি সব সময় আপনাকে স্মরণ করি।আমাকে এমন অন্তর দান করুন, যা আপনাকে ভালোবাসে,ভয় করে আর পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ

1. সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮–৮৯
2. সূরা আশ-শামস: ৯–১০
3. সূরা জুমুআ:০২
4. সহীহ মুসলিম:২৫৬৪
5. তিরমিজি, হাদীস: ২১৪০
6. সূরা আশ-শামস: ৯
7. সূরা আল-হাদিদ: ২০
8.সহীহ মুসলিম, হাদীস:২৯৯৪
9. সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত ৬৯
10. সূরা আল-মুজাদিলা: ১১
11. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২৩৬৩০
12. সূরা লুকমান: ১৮
13. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬২৮
14. সহীহ বুখারি,হাদীস: ৬৩৬৬
15. মুসনাদে আহমদ
16. সূরা রাদ: ২৮
17. সূরা আল-বাকারা: ১৬৫
18. সহীহ বুখারী,হাদীস: ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৪৩
19. সূরা আল-বাকারা: ১৫২
20. তিরমিজি,হাদীস: ৩৩৭৫
21. সহীহ বুখারি,হাদীস:৬১৩৬; সহীহ মুসলিম
22. ইবনু মাজাহ,হাদীস: ৪৩৭৮
23. তিরমিজি,হাদীস: ৩৫৫২
24. সহীহ বুখারী,হাদীস:২৫০৭
25. সূরা ফাতিহা: ৬
26. তিরমিজি,হাদীস: ২১৯০
27. সূরা গাফির: ৬০
28. সূরা আম্বিয়া: ৮৭
29. সূরা আত-তাওবা: ১০০
30. সহীহ বুখারী, হাদীস:৩৬৫১
31. সূরা আহযাব: ২১

32. সূরা কাহফ: ২৮
33. সূরা তাওবা: ১১৯
34. তিরমিজি, হাদীস:২৩৭৮
35. সহীহ বুখারী,হাদীস: ৫৫৩৪;সহীহ মুসলিম, হাদীস:২৬২৮
36. সূরা যুখরুফ: ৬৭
37. সূরা কালাম: ৮–৯
38. সূরা আল-বাইয়্যিনাহ:০৫
39. সহীহ বুখারী,হাদীস:০১
40. সহীহ মুসলিম, হাদীস:১৯০৫
41. মুসনাদে আহমদ
42. সূরা আলে ইমরান: ২৯
43. মুসনাদে আহমদ,হাদীস:23630
44. সূরা আত-তাহরীম:০৮
45. সহীহ বুখারী,হাদীস:৫২
46. তিরমিজি, হাদীস:২২৭৬
47. সূরা আল-কাহফ:১১০
48. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১
49. আবু দাউদ,হাদীস:৪৯০৩
50. সূরা ত্বা-হা:১২৪
51. সূরা আন-নিসা:১৭
52.সূরা সোয়াদ: ২৯
53.সূরা আহযাব: ৪১
54.তিরমিজি,হাদীস: ৩৩৭৭
55.তিরমিজি,হাদীস: ৩৩৭৫
56.তিরমিজি,হাদীস: ২৬১৬
57.সূরা আন-নিসা:৬৯
58.সূরা আনকাবূত:৪৫
59.সহীহ বুখারী,হাদীস:৬৫৮
60.সূরা ইউনুস:৫৭
61.সহীহ বুখারী: ৬২৪৭
62.সূরা বনি ইসরাইল:৭৯
63.সহীহ বুখারী:৬৬০,সহীহ মুসলিম:১০৩১
64.সূরা গাফির:৬০

65.সূরা তাহরীম:০৬
66.তিরমিজি,হাদীস:২৪৫৯
67.সূরা মুত্তাফিফীন:১৪
68.সহীহ বুখারী, হাদীস:৬৩০৮
69.সূরা আলে ইমরান:১৬০
70.তিরমিজি, হাদীস: ২৩১৭
71.সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৬৪
72.সূরা আ'রাফ: ২৩
73.সূরা ইবরাহীম: ৪০
74.সূরা আম্বিয়া: ৮৭
75.সূরা আলে ইমরান:০৮
76.সূরা আশ-শু'আরা:৮৩
77.সূরা আল-কাসাস:১৬
78.সূরা আল-হাক্কফ:১৯
79.সহীহ মুসলিম,হাদিস:১৬৪৪
80.তিরমিজি,হাদীস: ২৪৫৯